

লোকসাহিত্যের আলোকে পরিবেশ সচেতনতা : বাঁকুড়ার জেলার রানীবাঁধ ব্লকের একটি সমীক্ষা

শিল্পা বিশ্বাস

সারসংক্ষেপ :

বিশ্ব উষ্ণায়ন, পরিবেশ দূষণ, আবহাওয়ার বিরূপ আচরণ প্রভৃতি সমস্যার কারণের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে আছে মানুষ এবং তার কার্যকলাপ। যার কারণে পৃথিবী ক্রমাগত দূষিত নরকে পরিণত হচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জোয়ারে পরিবেশ যে সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে তা থেকে পরিত্রাণের উপায় হতে পারে ঐতিহ্যবাদী সংস্কৃতি চর্চা। নগরায়ন, বিশ্বায়নের ফলে যে আশঙ্কাজনিত পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে মুক্তির উপায় হিসাবে অবলম্বন করতে হবে নিজস্ব সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধান এবং সংস্কৃতি চর্চা হয়েছে। আমাদের সংস্কৃতির বীজ যেখানে নিহিত আছে সেই লোক সমাজেও এই পরিবেশ ভাবনার বিষয়টি যে প্রসারিত হয়েছে তা বলা বাহুল্য, আমরা তা উপলব্ধি করতে পারি বিভিন্ন লোকসাহিত্যের মধ্যে। বর্তমান প্রবন্ধটিতে লোকসাহিত্যের আলোকে কিভাবে পরিবেশ সচেতনতা ফুটে উঠেছে তার বিভিন্ন নিদর্শন পাওয়া যায় বাঁকুড়া জেলার রানীবাঁধ ব্লকের বিভিন্ন মৌখিক ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ ও লোকছড়ার মাধ্যমে।

মূলশব্দ : বিশ্ব উষ্ণায়ন, পরিবেশ দূষণ, নগরায়ন, ঐতিহ্যবাদী সংস্কৃতি চর্চা, লোকসাহিত্যের আলোকে পরিবেশ সচেতনতা।

প্রাককথন :

অর্থনৈতিক অগ্রগতি, নগরায়ন, শিল্পায়নের কারণে পরিবেশ প্রতিনিয়ত ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে মানুষের চাহিদা, প্রয়োজনও বদলাচ্ছে। জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধি পরিবেশের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে। মানুষ নিজের চাহিদা নিবারণের তাগিদে প্রতিনিয়ত প্রকৃতিকে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত করে প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে। যার বিরূপ প্রভাব পড়েছে পরিবেশের ওপর। অসাবধানতা, অসহিষ্ণুতা পরিবেশকে ক্রমাগত ধ্বংসের পথে ত্বরান্বিত করেছে। মাত্রারিক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ পরিবেশকে মানুষ ও প্রাণীর বসবাসের অযোগ্য করে তুলছে। বিশ্ব উষ্ণায়ন, পরিবেশ দূষণ, আবহাওয়ার বিরূপ আচরণ প্রভৃতি সমস্যার কারণের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে আছে মানুষ এবং তার কার্যকলাপ। যার কারণে পৃথিবী ক্রমাগত দূষিত নরকে পরিণত হচ্ছে। শিল্প বিপ্লবের দরশন মানুষের চাহিদার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে বৃক্ষছেদনের এবং পরিবেশ দূষণের মাত্রা। এই দূষণ একদিকে যেমন মানব সমাজের ক্ষতির কারণ তেমনি এর কবল থেকে মুক্তি পায়নি বিভিন্ন জীবকুল। বৃক্ষ নিধনের দরশন বাসস্থান হারাচ্ছে বিভিন্ন প্রাণী। জল দূষণের কারণে বিপন্নতার সম্মুখীন হয়েছে বিভিন্ন জলজপ্রাণী। পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি এমতাবস্থায় অতি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে তা নাহলে খুব শীঘ্রই সম্পূর্ণ প্রাণীকুল অস্তিত্ব সঙ্কটের

বিদ্যমান। এই চরম সঙ্কট থেকে মুক্তির উপায় আমাদেরই খুঁজে বের করতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার করতে হবে পরিবেশের সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে। বর্তমান পৃথিবীতে এই পরিবেশকে টিকিয়ে রাখা বা পরিবেশের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধির কথা সম্প্রচারিত হচ্ছে চারিদিকে। কারণ মানব সভ্যতার বিধ্বংসী রূপ আজ আমাদের পরিবেশের ওপর থাবা বসিয়েছে। আমরা যদি সচেতন না হই তবে এই পরিবেশকে টিকিয়ে রাখা আর হয়ত সম্ভব হবেনা। এর ফলে একদিন এই পৃথিবী ধ্বংসের মুখোমুখি হবে এবং তার ফলে এই পৃথিবীতে জীবের আর কোন অস্তিত্ব থাকবে না। তাই আমাদের উচিত পরিবেশকে রক্ষা করা। বর্তমানে পরিবেশ সচেতনতার ব্যাপক প্রসার চারিদিকে পরিলক্ষিত হয়। লোকসমাজও এর আওতা থেকে বাদ পড়েনি। কারণ এই লোকসমাজের মধ্যেই আমাদের সংস্কৃতির বীজ নিহিত আছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জোয়ারে পরিবেশ যে সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে তা থেকে পরিত্রাণের উপায় হতে পারে ঐতিহ্যবাদী সংস্কৃতি চর্চা। নগরায়ন, বিশ্বায়নের ফলে যে আশঙ্কাজনিত পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে মুক্তির উপায় হিসাবে অবলম্বন করতে হবে নিজস্ব সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধান এবং সংস্কৃতি চর্চা। লোকসাহিত্য লোকসংস্কৃতির একটি বিশেষ অংশ। লোকসাহিত্যে যেমন লৌকিকজীবন তথা সমাজজীবনের চিত্র ফুটে ওঠে তেমনি পরিবেশ সচেতনতামূলক নিদর্শন নানাভাবে ফুটে উঠেছে। প্রাচীনকাল থেকেই পরিবেশগত জ্ঞান এবং জীবপরিবেশগত সংরক্ষণের সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতির ভূমিকা অনস্বীকার্য। লোকসাহিত্যের সাথে জীবপরিবেশগত ঐতিহ্যমূলক জ্ঞানের এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। জীবপরিবেশগত জ্ঞান বলতে বোঝায় প্রকৃতির এক জীবসত্তার সাথে অন্য জীবসত্তার সম্পর্কজনিত জ্ঞান। লোকসাহিত্যে নানাভাবে ফুটে ওঠা পরিবেশ সচেতনতা পরিবেশ সংরক্ষণে এক ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। লোকসাহিত্য মানবসমাজকে পরিবেশের সান্নিধ্যে আসার, পরিবেশকে আরো ভালো করে জানার সুযোগ করে দেয়। লোককাহিনীগুলিতে পরিবেশমূলক মূল্যবোধ পরিস্ফুটিত হয়। লোকসাহিত্য দীর্ঘকাল ধরে সমাজ সচেতনতার সাক্ষর বহন করে চলেছে যার উদাহরণ নানা সময় পাওয়া যায়। যেমন কৃষিকাজ, কৃষিব্যবস্থাপনার এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায় নিম্নলিখিত খনার বচনে—

“রুয়ে কলা না কেটো পাত

তাতেই কাপড়, তাতেই ভাত।”

লোককাহিনী বা লোকসাহিত্য শিশু মননে মূল্যবোধ জাগ্রত করার বিষয়ে এবং সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক নৈতিকতা জাগরণে এক অনন্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটিতে বাঁকুড়ার লোকসাহিত্যে পরিবেশ ভাবনার নানান দিক তুলে ধরা হয়েছে।

যেকোনো গবেষণাকর্ম কিছু উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সাধিত হয়। সেই উদ্দেশ্যগুলোকে সামনে রেখে গবেষণার মূল কেন্দ্রবিন্দুতে উপনীত হওয়া সম্ভব। এই গবেষণা কর্মটির উদ্দেশ্যগুলি পর্যায়েক্রমে নিম্নরূপ :

- প্রথমত : বাঁকুড়ার লোকসাহিত্যে পরিবেশ ভাবনা কিভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে তা তুলে ধরা।
- দ্বিতীয়ত : লোকসাহিত্যে পরিবেশ ভাবনা সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ করা।
- তৃতীয়ত : এই লোকসাহিত্যের মধ্য দিয়ে সমাজের মানুষকে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

অনুসৃত পদ্ধতি :

এই গবেষণা কর্মটিকে সম্পূর্ণ করতে কতগুলি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। পদ্ধতিগুলি নিম্নরূপ :

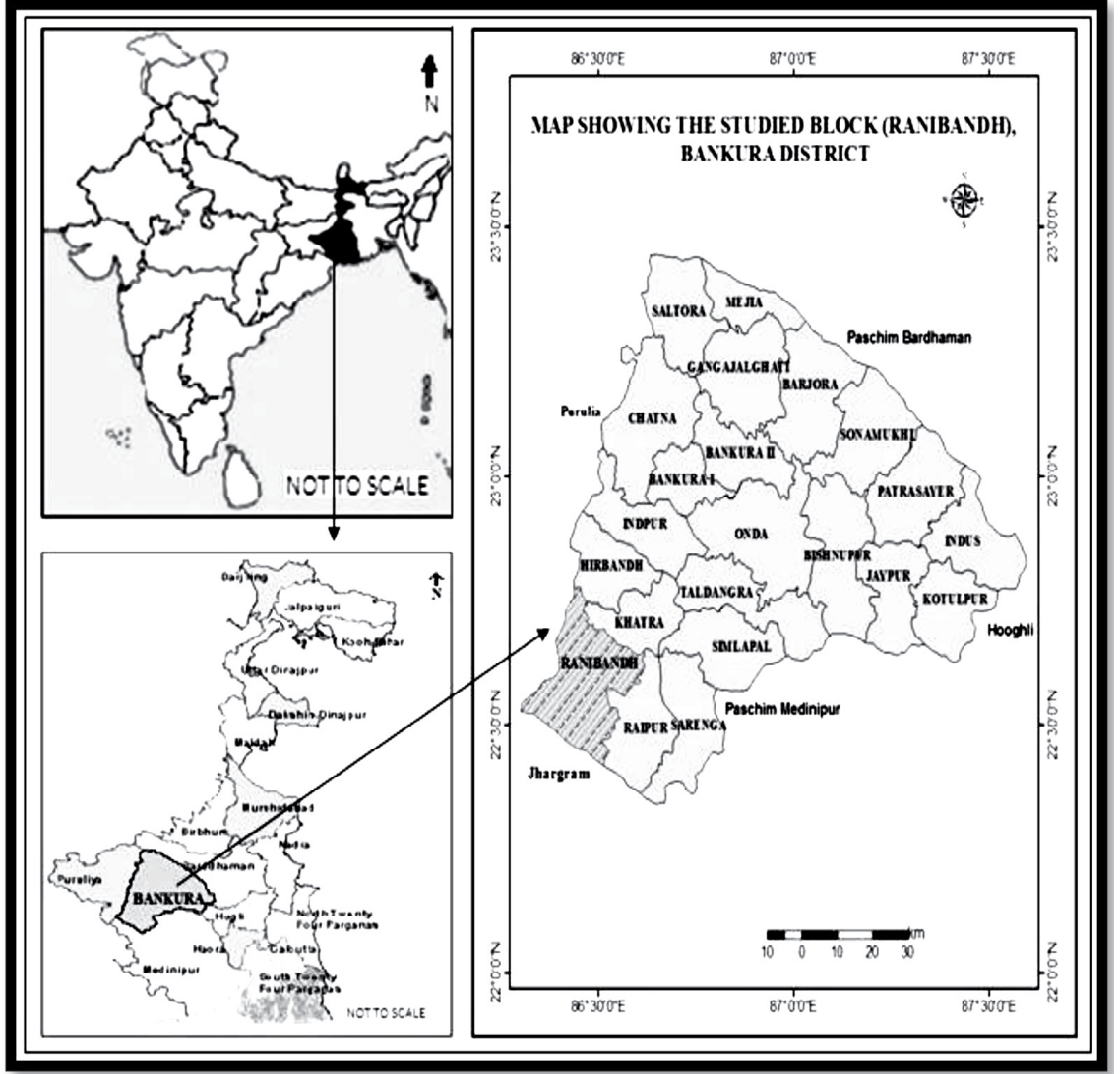
কোন স্থানে গবেষণা কর্মটি সম্পাদিত হবে তার জন্য গবেষণা কর্মের পূর্বে অঞ্চল নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান গবেষণাটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার রানিবাঁধ ব্লকে সম্পাদিত হয়েছে। এটি বাঁকুড়া টাউনের দক্ষিণে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরে এবং খাত্রার সাব-ডিভিশনাল হেড কোয়ার্টার্স থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে নিবিড় ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে। তথ্য সংগ্রহের জন্য আদর্শ নৃতাত্ত্বিক ক্ষেত্র অনুসন্ধান পদ্ধতিগুলি যেমন প্রশ্নাবলীর পদ্ধতি, সাক্ষাতকার পদ্ধতি, কেস স্টাডি পদ্ধতি, পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি, ফটোগ্রাফিক ডকুমেন্টেশনের সাথে সরাসরি কথোপকথন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে পারপাসিভ স্যামপ্লিং পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণা কর্মের উপযোগী গৌণ তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে বিভিন্ন প্রকাশিত-অপ্রকাশিত গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, ইন্টারনেট থেকে।

অনুশীলন অঞ্চলের পরিচয় :

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে পশ্চিমাঞ্চলের সুপ্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত জেলা বাঁকুড়া। জেলাটি উত্তর-পশ্চিমে চূড়াস্তভাবে প্রসারিত এবং আকৃতিগত দিক থেকে দ্বিসমত্রিভুজের মতো (চিত্র ১)। উপজাতি জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ নিয়ে গঠিত এই জেলা অসংখ্য অর্থনৈতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। এই জেলা যে শুধুমাত্র ভারতীয় শিল্পকলাতেই তার অবদান রেখেছে তা নয় বরং প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক উপাদানের ক্ষেত্রেও এই জেলা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। সমগ্র জেলাটি কেবলমাত্র অবিশ্বাস্য মধ্যযুগীয় পোড়া মাটির মন্দির এবং তার গৌরবময় অতীতের জন্যই নয়, অন্যান্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যথা টেরাকোটা শিল্প, বালুচরী শাড়ি, বিষ্ণুপুর সংগীত ঘরানা, দশাবতার ও নকশা তাস, শঙ্খশিল্প, ধাতুশিল্প ইত্যাদির জন্যও জগৎ বিখ্যাত (Bain, 2016)।

জেলার পার্থিব বিভাগটি (terrestrial section) ৬৬৮০ বর্গকিলোমিটার যা রাজ্যের পুরো স্থলভাগের ১০% রচনা করে। অঞ্চলটি হুগলি, বর্ধমান, পুরুলিয়া এবং মেদিনীপুর জেলাগুলির দ্বারা বেষ্টিত। ২০১১ সালের আদম শুমারি অনুসারে জেলার পুরো জনসংখ্যা ছিল ৩.৬ মিলিয়ন (জেলা শুমারী হ্যান্ডবুক, বাঁকুড়া, এবং ভারতের আদমশুমারি, ২০১১)। বাঁকুড়া জেলা তিনটি মহকুমা নিয়ে গঠিত, বিশেষত বাঁকুড়া সদর, বিষ্ণুপুর এবং খাত্রা। এখানে বাইশটি সি.ডি ব্লক (কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট ব্লক), তিনটি পৌরসভায় যেমন : বাঁকুড়া, এবং সোনামুখী, বিষ্ণুপুর এবং একশ নব্বইটি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। ছোট নাগপুর মালভূমি এবং নিম্ন গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের পলল সমভূমির মধ্যে মধ্যবর্তী অংশের সাথে জেলাটি বিস্তৃত রয়েছে।

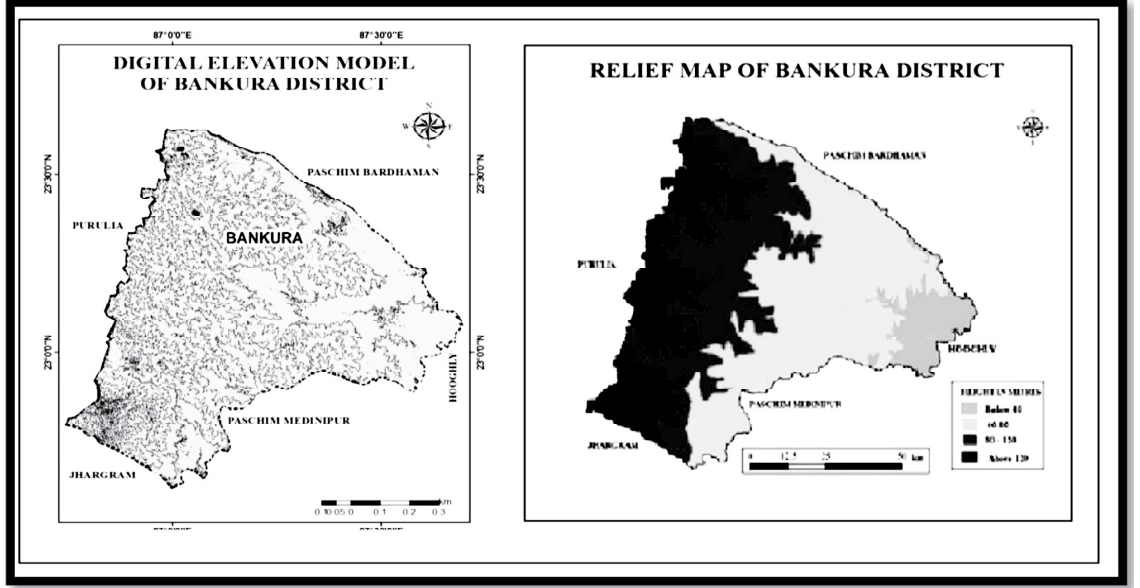
লোকসাহিত্যের আলোকে পরিবেশ সচেতনতা : বাঁকুড়ার জেলার রানীবাঁধ ব্লকের একটি সমীক্ষা



(চিত্র ১ : গবেষণা ক্ষেত্রের স্থানিক ম্যাপ)

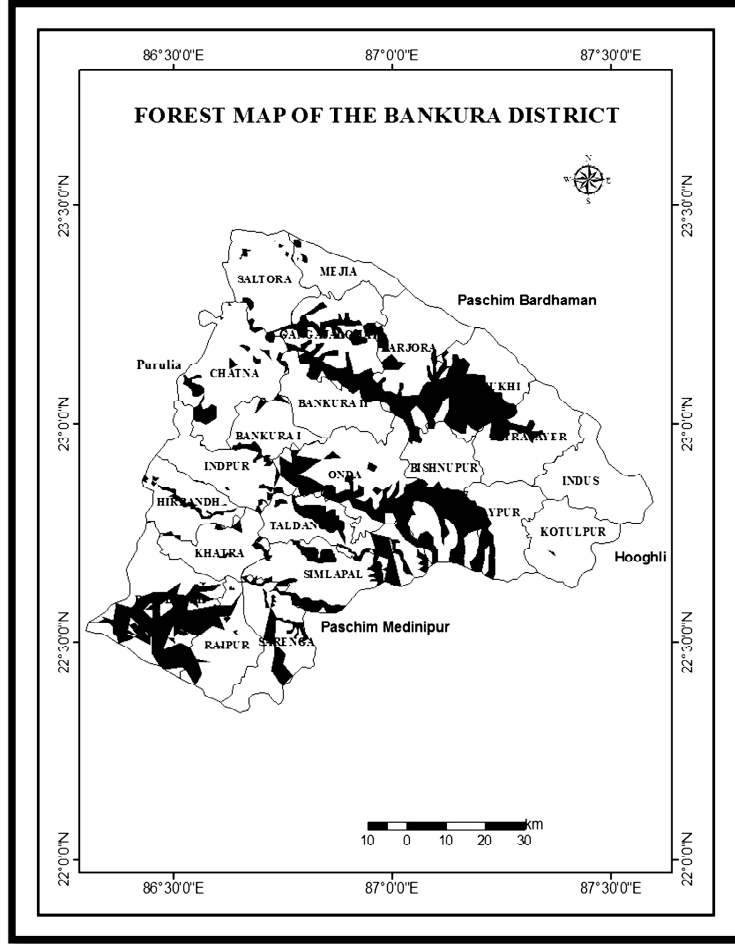
ফিসিওগ্রাফিক প্রপারটিস অনুসারে এই জেলাকে তিনটি স্বতন্ত্র প্রাকৃতিক শ্রেণিতে শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে। পশ্চিমে পার্বত্য অঞ্চল, মধ্যবর্তী অঞ্চলে অনুন্নত প্রসারিত এবং পূর্ব দিকের উর্বর নিম্নভূমি এই তিনটি প্রধান অংশ। এই অঞ্চলটি পূর্বের বিশাল পলল সমভূমি এবং পশ্চিমে ছোটনাগপুর মালভূমির বেয়ার স্পোরের সামগ্রিক দিকগুলিতে

প্রসারিত। এই অঞ্চলের সামগ্রিক উচ্চতা এমএসএল (MSL) থেকে ২০ থেকে ২০০ মিটার (সমুদ্রের স্তর) পর্যন্ত প্রসারিত। অঞ্চলটির ঢাল পরিলক্ষিত করলে দেখা যায় যে পশ্চিম থেকে পূর্বের দিকে ক্রমশ ঢালু হয়েছে (চিত্র ২)।



(চিত্র ২: বাঁকুড়া জেলার ডিজিটাল এলিভেশন ও রিলিফ ম্যাপ)

জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছোট বোপ বা বন দ্বারা গঠিত জেলার ঢালু স্থান ছোট নাগপুর মালভূমির বাইরের অংশের সমন্বয়ে গঠিত। এই অঞ্চলের বনাঞ্চল (চিত্র ৩)। ১৪৮১.৭৭ বর্গ কিমি (পুরো ভৌগলিক অঞ্চলের ২১.৫) নিয়ে গঠিত। বিভিন্ন ধরনের গাছ, গুল্ম এবং লতা বাঁকুড়া অঞ্চলে অনন্য। বিহারিনাথ, শুশুনিয়া পাহাড়, রানিবাঁধ, খাতরা, সোনা মুখী ইত্যাদির অবিচ্ছিন্ন বনাঞ্চল এই জেলাকে প্রাকৃতিক দিক থেকে এক অনন্য মর্যাদা প্রদান করেছে।



(চিত্র ৩: বাঁকুড়া জেলার ভেজিটেশন ম্যাপ)

লোকসাহিত্য :

লোকসাহিত্য হল সংহত সমাজের সামগ্রিক প্রচেষ্টার পরিণতি। এক্ষেত্রে কোন একক দাবী প্রাধান্যের বদলে সামগ্রিক দাবী প্রাধান্য লাভ করে। লোকসাহিত্য হল অনুভূতি, চিন্তাভাবনা, আবেগ, নাচের আনন্দময় স্মৃতি, শিকার এবং হতাশা, শস্যের ব্যর্থতা, ব্যথা, হতাশার সাথে সংযুক্ত দুঃখের মুহূর্তগুলির একটি শৈল্পিক উপস্থাপনা। তবে এটি কোনও লিখিত আকারে পাওয়া যায় না; পরিবর্তে, মৌখিক ভাষায় পরিচয় পাওয়া যায়। কিছু কিছু কিংবদন্তি, পৌরাণিক কাহিনী, ছড়া, খাঁধা কিছু ভাষার লিখিত আকারে লিপিবদ্ধ রয়েছে যেমন ওলচিকি, ওড়িয়া, এবং কিছু ইংরেজি ভাষায়। লোকসাহিত্য যে সমাজের সৃষ্টি, তা আদিম সমাজ নয় বরং প্রান্তিক সমাজের সৃষ্টি। কারণ তাদের মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকলেও তা বিচিত্র সাংস্কৃতিক উপকরণে সমৃদ্ধ। বিষয়বস্তুর দিক থেকে দেখলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব

থেকে শুরু করে দেবদেবী, নদী-নালা, গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, জীব-জন্তু, পশু-পাখি এমনকি নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক জিনিসপত্রকে কেন্দ্র করেও তাদের কোন না কোন কথা ও কাহিনী প্রচলিত। আদিবাসীরা প্রকৃতির সমস্ত বস্তু এমনকি নিষ্প্রাণ পাথরের মধ্যেও প্রাণ রয়েছে বলে বিশ্বাস করে।

লোকসাহিত্য বিভিন্ন ধরনের যেমন—

- লোককাহিনী
- লোকপুরাণ
- ছড়া
- কিংবদন্তি
- ধাঁধা
- প্রবাদ

এই উপরের প্রকারগুলি গতানুগতিক বা কাব্য উভয় রূপেই পাওয়া যায়। লোককাহিনী, পৌরাণিক কাহিনী, কিংবদন্তি প্রসঙ্গ ক্রমে গল্পের শৈলীতে রয়েছে এবং প্রবাদ বাক্যগুলি লোক কবিতার ধরণে পাওয়া যায়।

লোকসাহিত্যের বিভিন্ন এই ধারাগুলিতে নানা সময়ে নানাভাবে পরিবেশ সচেতনতার চিত্র পরিস্ফুটিত হয়েছে যা নিম্নে আলোচনা করা হল :

লোককাহিনী :

লোককাহিনী লোকসাহিত্যের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। লোককাহিনীর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। গল্পগুলি সুদূর অতীতে তাদের উৎসগুলিকে একত্রিত করে এবং অন্তর্নিহিত অনুভূতি এবং আবেগকে চিত্রিত করে। লোককাহিনীগুলি বাস্তবতা এবং মায়াময় মিশ্রণ নিয়ে গঠিত যাকে দুটি বিভাগে বিভক্ত করা যায় :

- গল্পগুলির কোনও কাব্যিক উপাদান নেই।
- গল্পগুলিতে আয়াত বা বাণী আকারে কাব্যিক দিক রয়েছে।

পৌরাণিক কাহিনীতে আধ্যাত্মিক প্রাণী এবং কল্পিত চরিত্র বা জিনিসগুলি সম্পর্কিত কোনও জাতিগত সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের ক্ষেত্র রয়েছে। লোকসাহিত্যে নানা কাহিনী বৃক্ষ, পশু-পাখী বিষয়ক কাহিনী বর্ণিত আছে। এটি পৌরাণিক কাহিনী ও কিংবদন্তি থেকে পৃথক, যদিও এগুলি গল্পের একটি অংশ যেমন প্লট, ঘটনা, চূড়ান্ত চরিত্রের বিবর্তনকে বহন করে।

যেমন : দুবরাজ ও পাখালবতি কন্যা, এক সত্যদ্রষ্টা ব্রাহ্মণের গল্প, কুষ্ঠ স্বামী, আঁটকুড়ে রাজার গল্প ইত্যাদি। এই গল্পগুলিতে বিভিন্ন অলৌকিক জন্মের কাহিনী বর্ণিত রয়েছে যেখানে দেখা যায় অলৌকিক ক্ষমতাবলে মানুষ তার দেহের রূপ পরিবর্তন করে কখনও কোন গাছের রূপ, ফুল-ফলের রূপ আবার কোথাও পশুর রূপ ধারণ করেছে।

লোকসাহিত্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় শাখা হল লোককথা যা আজও সমাজ-জীবনকে প্রভাবিত করে বেঁচে আছে। লোককথা লোকপুরাণ থেকে মুক্তিলাভ করে স্বতন্ত্র শাখায় পরিণত হয়েছে। উভয়েই মৌখিক, তবে লোকপুরাণ মূলত দৈবনির্ভর অলৌকিক জগত। লোকপুরাণে পশুপাখি দেবত্বের আসন লাভ করেছিল। তাদের হত্যা নিষিদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে লোকসাহিত্যে এই পশু-পাখি দেবত্ব ত্যাগ করে আরো নিকট আত্মীয়ে পরিণত হয়েছে। তাই সে কখনও

স্ত্রী-স্বামী, পিতা, কখনও বা সন্তান, চিকিৎসক, পথ প্রদর্শক, পরামর্শদাতা, পালক, ধাত্রী, প্রেমিক, প্রবঞ্চকও বটে। এরা প্রত্যেকেই পশুরূপী মানবীয় চরিত্র। পৃথিবীর বিভিন্ন লোককথায় এমন অনেক নিদর্শন পাওয়া যায় যেখানে পশু মানুষের পরম বন্ধু হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু তার উপদেশকে অমান্য করলেই বিপদে পড়তে হয়েছে নায়ক-নায়িকাকে। লোককথায় পশু বিবাহ একটি বিশিষ্ট উপাদান। পৃথিবীর সমস্ত সাংস্কৃতিক বলয়েই এই বিবাহ পাওয়া যায়। এই ধরনের বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার কারণ পশুকথা (Animal tale) বা গাছ সম্পর্কিত বিশ্বাসের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। পশু এখানে একেবারেই নিকট সদস্য। এই পশু বিবাহে পশু স্বামীও হতে পারে, স্ত্রীও হতে পারে অথবা সন্তানও পশু হতে পারে। কারোর অভিষাপ বা জাদুক্রিয়ার প্রভাবে সে পশুতে রূপান্তরিত হয়। পশুর ন্যায় গাছও লোককথায় বিশেষ স্থান পেয়েছে। কারণ, বাংলায় বিশেষ করে গাছের শিকড়, কলা বা বিশেষ কোন ফল খেয়ে রানীরা সন্তানসম্ভবা হয়েছে। আবার দুই সতিনের মধ্যে দুয়োরানী কূটকৌশল করে সুয়োরানীর মাথায় শিকড় বেঁধে দেওয়ায় সুয়োরানী পাখী হয়ে উড়ে গিয়েছে। মানব শিশুকে মাটিতে পুঁতে ফেলায় সেখানে একটি গাছ জন্মায় যে গাছের প্রতিটি ফুল হল ভাইবোন, সাত ভাই ও এক বোন। গাছের ক্ষেত্রে যাদু বিশ্বাসই কার্যকরী হয়েছে বেশি। লোককথায় পশুজগত চারিত্রিক ভিন্নতায় মানব সমাজের নিখুঁত ইতিহাস আজও রচনা করে চলেছে। নিম্নে এরূপ কিছু লোককথা আলোচিত হল যেখানে মানুষ ও পশু-পাখি, গাছপালার এক অপূর্ব মিলবন্ধন পরিলক্ষিত হয়।

১. সাবাই গাছের জন্মকথা : এক গ্রামে সাত ভাই ও এক বোন বসবাস করত। ভাইরা মনস্থির করল তারা একটি পুকুর কাটবে। ভাইরা পুকুর কাটে আর বোন ভাইদের জন্য খাবার এবং জল নিয়ে এসে ভাইদের খাওয়ায়। বহুদিন মাটি কাটার পরেও, অক্লান্ত পরিশ্রম করেও পুকুরে জল আর ওঠে না। তারা এক যোগীর কাছে এই সমস্যা নিবারণের উপায় জানতে চাইলে যোগী জানায় যে তারা তাদের বোনকে এই পুকুরে বিসর্জন দিলে তবেই জল উঠবে। তারা এই উপদেশ শুনে চমকে উঠলেও তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য শেষে বাধ্য হয়ে তাদের বোনকে বিসর্জন দেওয়ার মনস্থির করে বিসর্জন দিয়ে দেয়। এদিকে বোনের বিয়ের দিন এগিয়ে আসে। কিন্তু তারা বোনের মৃত্যুর ব্যাপারে তাদের মা-কে খবর জানায় না। বিয়ের দিন পাত্র বিয়ে করতে এসে পাত্রী না থাকায় পাত্র অশান্তি করে চলে যাওয়ার সময় পুকুরে সুন্দর একটি ফুল দেখে তুলে আনতে বলে তার বেহারাদের। তারা ধরতে গেলেই ফুলটি দূরে সরে যায়। শেষে পাত্র গেলে ফুল নিজে ধরা দেয়। পাত্র সম্পূর্ণ গাছ সমেত তুলে এনে পালকিতে রাখে। কিছুক্ষণ পর বরযাত্রীরা দেখে এক অপূর্ণ সুন্দরী বউ পালকিতে বসে আছে। বোন শিশুর বাড়ি চলে যাওয়ার পর ভাইদের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি দেখা যায়। অভাবের মধ্য দিয়ে জীবন-যাপন করতে শুরু করে। অভাবের তাড়নায় তারা শালপাতার থালা বানিয়ে সেগুলি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। একদিন থালা বিক্রি করতে করতে বোনের বাড়ির কাছে চলে যায়। বোন তাদের দেখে চিনতে পারে এবং ভাইদের দুর্দশা দেখে কাঁদতে থাকে। বোন তাদের কাছে জানতে চায় তাকে বিসর্জন দেওয়ার কারণ। এই প্রশ্ন করার সাথে সাথে মাটি ফাঁক হয়ে যায় এবং তারা একে একে ফাটলে ঢুকে যেতে থাকে। এক এক করে ৫ ভাই ফাটলে ঢুকে যেতে থাকে। কোনক্রমে ছোটভাইয়ের চুল ধরেও আটকাতে পারেনা। কিছু চুল ছিঁড়ে আসে তার মুঠিতে। ছোট ভাইয়ের স্মৃতি, হাতের মুঠোয় ধরা চুলগুলো যত্ন করে চোখের জলে ভিজিয়ে পুঁতে দেয় তার বাড়ির বাগানের এক কোনে মাটিতে। সেই মাটিতে রোজ যত্ন করে জল দিয়ে পরিচর্যা করে। ফলস্বরূপ, কিছুদিন পরে সেখান থেকে সাবাই গাছের জন্ম হয় (Majumder, 2001)।

২. বাঁশ গাছের জন্মকথা : মরলা নামে এক ব্রাহ্মণ কন্যা ছিল। সে নিজের অজ্ঞাতে নিম্ন সম্প্রদায়ের লোককে বিয়ে করেছিল। কিছুদিন পরে সে জানতে পারে যে সে যাকে বিয়ে করেছে সে নিম্ন সমাজের। সে তখন নিজের জীবন শেষ করবে বলে মনঃস্থির করে বিষ্ণুর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করে যে পাহাড়ের ওপর তার চিতা তৈরি হবে এবং

সেটাই হবে তার সমাধিক্ষেত্র। কথামত তাই হয় এবং সেই চিতার ছাই থেকে কিছুদিন পর এক গোছা বাঁশগাছের জন্ম হয় (Majumder, 2001)।

৩. শিকারি ও কুকুর : এক সময় কুকুর বনেই থাকত। সে ছিল বুনো কুকুর। অন্য বুনো পশুদের সে খুব ভয় পেত। ভাবত, তাদের সঙ্গে বোধহয় পেরে উঠবে না। তাই লুকিয়ে চুরিয়ে একাই বনে বাস করত। তার কোন বন্ধু ছিল না। একদিন সে মনস্থির করল যে কোন সাহসী কেউ থাকলে তার আর এই জঙ্গলে থাকতে কোন অসুবিধা হবে না তাই তার কোন সাহসী বন্ধু দরকার। সাহসী বন্ধু পাতানোর আশায় নির্জন গুহা থেকে বেরিয়ে পড়ল। পথে এক ঝোপের পাশে দেখা হল খরগোশের সাথে। সে খরগোশকে প্রস্তাব দেয় তার সাথে বন্ধুত্ব করার জন্য। তার প্রস্তাবে রাজি হয়ে খরগোশ এবং কুকুর একসাথে থাকতে শুরু করে। মাঝ রাতে দু'একটি পাখির কিচিরমিচির শব্দে কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে করে চিৎকার শুরু করে। সেই শব্দে খরগোশের ঘুম ভেঙ্গে গেল এবং খরগোশ ফিসফিস করে তাকে চুপ করার অনুরোধ জানাল এবং সাবধান করল যে নেকড়ে শুনতে পেলে তাদের দুজনেরই আর রক্ষা নেই। এই শুনে কুকুর ভাবল যে সে ভুল জনের সাথে বন্ধুত্ব করেছে। সাহসী বন্ধু জোটাতে হবে। এই ভেবে গুহা ছেড়ে সে চলল নেকড়ের সন্ধানে। নেকড়ের সাথে দেখা হতে নেকড়েকেও বন্ধুত্বের প্রস্তাব দিল। নেকড়ে রাজী হওয়ায় নেকড়ের সাথে থাকতে শুরু করল। হঠাৎ একদিন রাতে কুকুর আবার চিৎকার করতে থাকল। চিৎকার শুনে নেকড়ে তাকে পাহাড়ি ভালুকের ভয় দেখিয়ে চুপ করতে বলল। কুকুর সেটা শুনে ভাবল পাহাড়ি ভাল্লুক বেশি সাহসী। এই ভেবে পাহাড়ি ভাল্লুকের সাথে বন্ধুত্ব করতে গেল। ভাল্লুকের সাথে বন্ধুত্ব করে তার সাথে একই জায়গায় থাকতে শুরু করল। মাঝ রাত্তির, চারিদিক নিঝুম হঠাৎ কুকুর ডেকে উঠল। ঘেউ ঘেউ শব্দে পাহাড়ি ভালুকের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে ভয়ে কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতে কুকুরকে চিৎকার করতে মানা করল এবং সাবধান করল চিৎকার করলে শিকারি মানুষ এসে তাদের শিকার করবে। কুকুর তখন বুঝতে পারল সব থেকে সাহসী শিকারি মানুষ। সে তখন শিকারি মানুষের সন্ধানে বেরাল। যেতে যেতে মানুষের দেখা পেল। সে শিকারি মানুষকে দেখে খুব খুশি হয়ে তার বন্ধুত্বের আর্জি জানাল। শিকারি তার আর্জিতে রাজী হয়ে বন্ধুত্ব স্থাপন করল। দুজনে তাঁবুতে ঘুমিয়ে পড়ল। হঠাৎ কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে শুরু করল। সেই ডাকে শিকারি উঠে পড়ে কুকুরকে বলল যে যদি খিদে পায় তাহলে সে বেরিয়ে শিকার ধরে আনো এবং তাকে আশ্বস্ত করে যে তার ভয় নেই কারণ তার কাছে তীর-ধনুক-বর্শা আছে সে তাকে রক্ষা করবে। কুকুর আনন্দে লেজ নাড়তে থাকে এবং বুঝতে পারে যে সে এত দিনে সত্যিকারের বন্ধু পেয়েছে। তারপর থেকে মানুষ ও কুকুর একসাথে থাকতে শুরু করল (Majumder, 2001)।

বাঁকুড়া জেলার বারিকুল গ্রামের থেকে সংগৃহীত লোককাহিনিতেও ফুটে ওঠে মানুষ আর জীবজন্তুর নিবিড় সম্পর্ক :

১. সর্পকন্যা : পিতৃ-মাতৃ হীন দুই ভাই-বোন ছাগল চরিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। একদিন বোনটি ছাগল চরাতে চরাতে রাজার বাড়ির বাগানের নিকট চলে এল এবং বাগানে খুব সুন্দর ফুল ফুটে রয়েছে দেখতে পেল। ফুলটি দেখে সে ভীষণভাবে আকর্ষিত হল এবং ফুলটি নেওয়ার আর্জি মালীকে জানালো। মালী ফুলটি দিতে অস্বীকার করল কারণ ফুলটি যে নেবে তার সাথে রাজপুত্রের বিয়ে হবে। মালী ফুলটি দিতে অস্বীকার করার সে নিজেই মালীর দৃষ্টি এড়িয়ে ফুলটি ছিঁড়ে নিল এবং রাজপুত্রের সাথে বিয়ে করতে হল। শাশুড়ি এতে সন্তুষ্ট হলেন না। রাজপুত্র মাঝে মাঝেই শিকারে যেতেন। যখনই তিনি শিকারে যেতেন তখনই ফন্দি করে শাশুড়ি রানীকে সাপ ভেজে খাওয়াতেন। এই ভাবে সাপ খেতে খেতে রানী সাপের রূপ ধারণ করলেন। তারপর শাশুড়ি তাকে গৃহত্যাগ করতে বাধ্য করলেন। রানী তার ছোটো ভাইকে নিয়ে আশ্রয় নিলেন এক জলাশয়ের ধারে। সেখানে মানবরূপী সন্তানের জন্ম দিলেন। এদিকে রাজা

শিকার থেকে বাড়ি ফিরে রানীকে দেখতে না পেয়ে তার মা-এর কাছে জানতে চাইলেন রানী কোথায়। তার মা-এর থেকে কোন সন্দেহের না পেয়ে তিনি নিজেই বেরিয়ে পড়লেন রানীর খোঁজে। খুঁজতে খুঁজতে চোখ গেল জলাশয়ের ধারে এক বট গাছের নীচে শুয়ে থাকা একটি শিশু এবং রানীর ভাইয়ের দিকে। সেখানে গিয়ে রানীর ভাইয়ের থেকে তিনি সব জানতে পারেন। রাজা তখন সাপের লেজ কেটে সাপের খোলস থেকে রানীকে উদ্ধার করে রাজ বাড়িতে নিয়ে আসেন।

২. এক শবর বৃদ্ধ-বৃদ্ধা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন এক বাঘের সাথে দেখা হল। বাঘ তাদের আক্রমণ করতে গেল তখন বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা ভয়ে আকুতি করতে শুরু করল এবং মিনতি করল যে সে তাদের যেন কোন ক্ষতি না করে তাহলে তারা তাকে আজীবন পূজা করবে। তখন বাঘ তাদের কথা শুনে তাদের ছেড়ে দেয়। তারপর থেকে তারা জঙ্গলে বগছত বা বাঘের পূজা করতে শুরু করে।

মানুষ তার চারপাশের প্রাকৃতিক জীবজ-অজীবজাত উপাদানের সাথে কিভাবে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল তার নিদর্শন উপরিউক্ত লোককথা গুলির মধ্যে দিয়ে পরিস্ফুটিত হয়।

লোকপুরাণ :

লোকপুরাণে মানুষের উৎপত্তিমূলক বা জন্ম বিষয়ক কিছু ধারণা দেওয়া হয়েছে। মানুষ ভাবে যে তার উৎপত্তি হয়েছে প্রাকৃতিক উপাদান বা জীব-জন্তু থেকে। সেই অর্থে মানুষ চন্দ্র-সূর্য-বায়ু-পাহাড়-পর্বত, নদীনালা, গাছপালা, ফুল-ফল, পাখিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করেছে। মানবসমাজের প্রকৃতি পূজার সৃষ্টি হল এই ভাবে। লোকপুরাণের মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন তেমনভাবে পরিলক্ষিত হয় না। যেহেতু মানুষের প্রাথমিক স্তরে সর্বত্রই চিন্তা-ভাবনা একই সূত্রে গাঁথা, শুধুমাত্র উপাদানগত পার্থক্য লক্ষিত। আঙ্গিকরূপের পরিবর্তন ঘটেছে সর্বজনবিদিত কাহিনী যখন নতুন করে বলা হয়েছে, তাতে কেউ বিমুগ্ধ হয়েছে কিংবা মুগ্ধ হয়েছে। হয়তো বা অতিলৌকিক ক্রিয়াকর্ম পুরাণ থেকে কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে। বিশ্বের লোকপুরাণগুলিতে অদ্ভুত দেহ বিশিষ্ট কিছু মানবের পরিচয় সর্বত্রই পাওয়া যায়। তবে এই ধরনের মানবের সৃষ্টি তাদের পশুরূপ ছদ্মবেশ ধারণেই হয়েছে। গ্রিক পুরাণে ত্রিনাস আপন পত্নীর ভয়ে ঘোড়ার ছদ্মবেশে স্যানাস কন্যা শিলাইরার সঙ্গে মিলিত হওয়ায় তাদের সন্তান মানুষ ও ঘোড়ার মিলিতরূপ পায়। গ্রীক পুরাণের স্ফিংকস-এর ওপরের অংশ নারী ও নীচের অংশ সিংহ এবং দুটি ডানা আছে। ভারতীয় পুরাণ নৃসিংহ এবং গনেশ মানুষ ও পশুর মিলিত রূপ। এছাড়া বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞা সূর্যকে পছন্দ না হওয়ায় পিতার কাছে ভর্ষিত হন এবং অশ্বিনীর রূপ ধরে ঘুরে বেড়ান। এই সংবাদ পেয়ে সূর্যও অশ্বরূপ ধারণ করে মিলিত হন এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্ম হয়। এখানে পশু-মানব, মানব-পশু মিলনও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আবার পশুরূপী মানব মিলনে পশু-মানবাকৃতির জন্ম হয়। মানুষ যেহেতু সর্বশেষ সৃষ্টি সুতরাং সম্পূর্ণ মানবাকৃতি পেতে সময় লেগেছে। পুরাণের এই চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ মানবাকৃতি পাওয়ার পূর্ব মুহূর্তের। লোকপুরাণে পশু থেকে মানবের সৃষ্টি যেমন সারা বিশ্বে কমবেশি পাওয়া যায়, তেমনি মানুষ পশুতে রূপান্তরিত হয়েছে তাও পুরাণে নিদর্শন পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে করম গাছকে কেন্দ্র করে ওঁরাও সমাজের দুটি লোকপুরাণের উদাহরণ দেওয়া হল যেটি বর্তমান ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় সংগ্রহ করা হয়েছিল।

সহরাই উৎসবে, ওঁরাও পুরুষরা শিকারে বেরাল। সেই সুযোগে, কিছু মানুষ মহিলা ওঁরাওদের ওপর আক্রমণ করে। তখন মহিলারা পুরুষদের জামা কাপড় পড়ে নেয় এবং তীর ধনুক নিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করে। এই ভাবে তিন বার তারা তাদের পরাস্ত করার পরেও তারা ওঁরাওদের আক্রমণ করে। তখন রাতের অন্ধকারে ওঁরাওরা পালিয়ে এক ঘন জঙ্গলের এক গুহায় আশ্রয় নেয়। ওঁরাওদের খুঁজতে এসে তারা তাদের খুঁজে না পেয়ে ফিরে চলে যায়। যেই

গুহায় ওঁরাও-রা আশ্রয় নিয়েছিল সেটির সামনে ছিল এক প্রকাণ্ড করম গাছ যার ফলে গুহাটি আড়াল হয়ে যায় এবং তাদের দেখতে না পেয়ে তারা ফিরে যায়। ফলস্বরূপ তারা বেঁচে যায়। তারপর থেকে ওঁরাও জনগোষ্ঠী করম গাছের পূজা করা শুরু করে।

পিতৃ-মাতৃ হারা খেরিয়া দুই বোন তাদের কাকা-কাকিমার সাথে থাকতো। তাদের কাকু তাদের দুই বোনকে খুব ভালবাসলেও তাদের কাকিমা তাদের মোটেও পছন্দ করতেন না। দুই বোনকে কাকিমা সব সময় কাজ করাতেন এবং নির্যাতন করতেন। একদিন প্রবল বর্ষায় তাদের কাকিমা তাদের ধানক্ষেতে পাঠালেন। প্রবল বর্ষায় চারিদিক জলমগ্ন হয়ে যায়। দুই বোন ডুবতে থাকে। সেই সময় তাদের সাপ কামড়ায়। তাদের কাকা তাদের বাড়িতে দেখতে না পেয়ে খুঁজতে বেরোয়। চারিদিক খুঁজে না পেয়ে দুঃখে মর্মান্বিত হয়ে বাড়ি ফেরার সময় দুই বোন সাপের রূপ নিয়ে তার সামনে আবির্ভাব হয়। কাকার কাছে তারা তাদের সম্পূর্ণ কাহিনী পরিব্যক্ত করে এবং জানায় যে তারা আর মানবরূপে ফিরতে পারবে না তারা সাখ এবং কোয়েল নামক নদী হয়ে সেখানেই বইবে। তারপর থেকে তারা নদী হয়ে বইতে থাকে। তারপর খেরিয়া সম্প্রদায়ের মানুষরা কোয়েল এবং সাখ নদীকে পূজা করতে শুরু করে।

ব্রতকথা :

ব্রত মূলত গোষ্ঠীর সম্পদ। এর মধ্যে লুকিয়ে আছে বিভিন্ন স্ত্রী-আচার। মহিলারা বা কুমারী মেয়েরা ব্রত পালন করে থাকেন। ব্রতের প্রসার সারা ভারতবর্ষে থাকলেও মূলত ভারতের পূর্বাংশে যেমন বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, বাংলাতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ব্রতের উৎপত্তি পশুচারণ ও কৃষিভিত্তিক স্তরেই। যেকোন সামাজিক সংস্কারের ভিত্তির মূল হল অর্থনীতি। প্রাগৈতিহাসিক কালে পশু শিকার ও সংগ্রহের মধ্যে যে গুহা যাদুবিশ্বাস ছিল সেটাই সেই সমাজের অর্থনীতির ভিত্তি। এই যাদুবিশ্বাসের স্মৃতিই পরবর্তীকালে ব্রতের রূপ পেয়েছে। ব্রতে পশুপূজার প্রচলন আছে। বিশেষ করে গৃহপালিত পশু হিসাবে গরুকে কেন্দ্র করে গো-কাল ব্রত, সুবচনী ব্রতের হাঁস, লক্ষ্মী ব্রতে পেঁচা, ষষ্ঠীব্রতে বিড়াল। সর্প পূজাও বা মনসা পূজাও বহুল প্রচলিত। যেসব দেবদেবীরা পশু আকৃতিতে পূজিত হয় তারা প্রকৃতপক্ষে দেবদেবীর বাহন। সুতরাং এই সব পশুকে হত্যা করা নিষিদ্ধ। নিম্নে এই প্রকার কিছু ব্রতের আলোচনা করা হল :

ষষ্ঠীব্রত :

এক বাড়িতে শাশুড়ি প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসে ষষ্ঠী ঠাকুরের পূজা করেন। স্নান করতে যাওয়ার সময় সব কিছু গুছিয়ে রেখে যান। শাশুড়ি স্নানে গেলেই বউ সমস্ত প্রসাদ নিজে খেয়ে বাড়ির বিড়ালের ওপর দোষ চাপায় যে বিড়াল সব আত্মসাৎ করেছে। বছরের পর বছর এই চলতে থাকে। বিড়াল এই আচরণে খুব রেগে যায় এবং মনস্ত্বির করে যে বউ এর কোলে ছেলে রাখবে না। যখনই বউ এর ছেলে হয় সে মুখে করে সেই ছেলে নিয়ে গিয়ে মা ষষ্ঠীর কাছে গাছের তলায় রেখে দিয়ে আসে। মা ষষ্ঠী বিড়ালের কাছে জানতে চাইলে বিড়াল বউ-এর কুকীর্তির কথা জানায়। এইভাবে সাত বছর সাত সন্তানকে নিয়ে যায় বিড়াল। শেষে পাড়াপড়শি সকলে বউকে রাক্ষসী মা বলে নির্দেহ করে। বউ রাত দিন দুঃখ পেতে দেখে মা ষষ্ঠীর তাকে ক্ষমা করে দেন এবং তাকে বলেন তার সন্তানদের কল্যাণের জন্য তার এবং তার বাহন বিড়ালের পূজা করতে।

গোব্রত :

রাঢ় অঞ্চলে সুরজের কিরণে চারিদিক রক্ষ শৃঙ্খল হয়ে ওঠে। তখন সেখানে থাকা গো-মহিষেরা ঠিক করে তারা সেখানে আর পরিশ্রম করতে পারবেনা। রক্ষ কঠিন মাটিতে ফসল ফলানো, দুধ দেওয়া, বোঝা বওয়ার পরিবর্তে

তাদের জোটে নিরস খড় বিচালি। তাই তারা মহাদেবের কাছে মানুষের বিরুদ্ধে নালিশ জানায়। মহাদেবের নির্দেশে অমাবস্যার রাতে মানুষেরা গরু, মোষ দেব স্নান করিয়ে সিঁদুর তেল হলুদ মাখিয়ে পূজো করে। এরপর থেকে গোপূজার সূত্রপাত হয়।

কিংবদন্তী :

ক্ষেত্রসমীক্ষায় সংগৃহীত এক কিংবদন্তীতেও পরিবেশ সংরক্ষণের উদাহরণ ফুটে উঠেছে যা নিম্নরূপ :

ওঁরাওরা কারামগাছকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে। কারামগাছের তারা রক্ষাকর্তা। তাদের কাছে এই গাছটির একটি আলাদা মর্যাদা রয়েছে। এই গাছ তাদের কাছে শুধুমাত্র একটি বৃক্ষ নয় তাদের জাতির অস্তিত্বের পরিচায়ক। আদিকাল থেকে তাদের মধ্যে কারাম গাছ নিয়ে কিংবদন্তী দেখা যায়।

ভাদ্রমাসে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ওঁরাওরা দশকারামের পূজা করে। দশকারাম নিয়ে তাদের মধ্যে একটি কিংবদন্তী রয়েছে। কস্ম ও ধস্ম নামে দুই ভাই একসাথে বাস করত। কস্ম কাজ-কর্মের সাথে যুক্ত ছিল এবং ধস্ম ধর্মচর্চা করত। একদিন কাজের শেষ কর্ম বাড়ি ফিরে দেখে যে তার ভাই ধস্ম একটি গাছের ডাল সামনে রেখে নৃত্য উৎসবে মেতে উঠেছে। তা দেখে কস্ম খুব ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে ডালটি ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ভাইয়ের এই আচরণ দেখে ধস্মের খুব কষ্ট হয়। এই ঘটনার কিছু দিন পর থেকেই তাদের জীবনে চরম অভাব দেখা যায়। তখন তারা উপলব্ধি করতে পারে যে পূজায় বাধা দেওয়ার ফলে তাদের এই পরিণতি হয়েছে। সেই বিপত্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ধর্ম ও কর্ম ফেলে দেওয়া সেই ডালের সন্ধানে বেরোয় এবং অনেক খোঁজার পর তারা দেখে যে সেই ডাল জলে ভেসে যাচ্ছে। তখন দুই ভাই সাঁতার কেটে সেই ডাল নিয়ে এসে বাড়িতে ডাল পুঁতে পূজো শুরু করে। এবং উপলব্ধি করে যে ধর্মহীন কর্ম এবং কর্মহীন ধর্ম উভয়েরই কোনও গুরুত্ব নেই। এই কিংবদন্তিরই আরেক প্রকার রূপের সন্ধান পাওয়া যায় ওঁরাও সম্প্রদায়ের মধ্যেই। ওঁরাও সম্প্রদায়ের আদর্শ মানব এবং মানবী ভাইয়া ও বহিন এক জঙ্গলে গরু চরাতে গেলে সেখানে হঠাৎ এক প্রবল প্রলয়ের সম্মুখে পড়েন তখন তারা তাঁদের প্রাণ বাঁচাতে একটি প্রকাণ্ড করম গাছের নীচে আশ্রয় নেন। সেই যাত্রায় তাঁরা বেঁচে যান। তারপর তারা সেই গাছের ডাল নিয়ে এসে তাঁদের বাড়ির উঠোনে পূজা করতে শুরু করেন।

লোক ছড়া :

লোক ছড়া সংস্কৃতির এক অপরিহার্য উপাদান। লোকছড়াগুলির উৎস এখনও অস্পষ্ট। ছড়ায় সমাজচিত্রের পরিষ্কার প্রতিফলন দেখা যায়। ছড়ার বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন তার উপাদান পৃথিবী বহির্ভূত নয়। কল্পজগতের স্থান কমই। ছড়াতে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান গুলি ফুটে ওঠে। কৃষিকাজ বাঁকুড়া জেলার অধিকাংশ লোকের প্রধান জীবিকা। কৃষিজাত ফসলের প্রধান হল ধান। বাঁকুড়া জেলার পশ্চিমাংশে ধান চাষ কম হলেও পূর্ব, উত্তর, ও দক্ষিণ বাঁকুড়ায় বরাবর ধান চাষ ভালো হয়। ধান চাষ নিয়ে সেখানকার মানুষ নানারকম ছড়া রচনা করেছেন। এই ছড়াগুলির মধ্য দিয়ে কৃষক শ্রেণীর মনের পরিচয় ফুটে উঠেছে। এখানে কিছু বাউরিদের লোকছড়া সম্পর্কে আলোচনা করা হল যেগুলির মাধ্যমে প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়। এই লোকছড়াগুলি বর্তমান ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় সংগ্রহ করা হয়েছিল।

“ডাক দিয়ে কয় রাবন
কলা পোতে আষাঢ় আর শ্রাবন,
কলা পুতে না কেটো পাত,
তাতেই হবে কাপড় আর ভাত।”

এই ছড়ার মধ্যে দেখা যায় যে রাবন সবাইকে আষাঢ়-শ্রাবন মাসে কলা চাষের পরামর্শ দিয়েছেন। তার মতে কলা চাষ করলে অন্ন-বস্ত্র সংস্থানের কোন অভাব তাদের হবে না। অর্থাৎ কলা চাষের উপযোগিতা সম্পর্কে এখানে আলোকপাত করা হয়েছে।

বাঁকুড়া জেলার হলুদ কানাড়ি গ্রামের মহিলারা আকাশে ঘন কাল মেঘ দেখলেই ধানের বীজ রোপনের কথা ভাবে। এবং আনন্দে আত্মহারা হয়ে যে ছড়াটি বলেন তা হল :

“মেঘ করেছে আকাশে
বিচ পুঁতবো মাঠে
বিচ তলাতে লক্ষ্মী ঠাকুরন
বসবেন আশ্যে পাটে।”

আকাশে মেঘ দেখে বীজ রোপন করার কথা উল্লেখিত হয়েছে। বীজ রোপনের পর পাট চাষ করলে সেখানে মা লক্ষ্মী বিরাজমান হবেন। অর্থাৎ টাকা পয়সার আর অভাব হবেনা।

“চাষ করবি আপন মনে
ঘর ভরাবি ধনে ধানে”।

চাষ করার পরামর্শ এই কবিতার মধ্যে ফুটে উঠেছে। চাষ করলে ধানের অভাব হবেনা সেই কথাই এখানে পরিব্যক্ত হয়েছে।

“মাঠ হয় যদি সবার কোনে
ফলন ফলবেক সবাই জানে
মাঠ হয় যদি সবার মাঝে
বাড়বে ফলন লাজে লাজে।”

মাঠের মাঝে চাষ করা হলে ফলন হলে সেটা সবার দৃষ্টি আরোপ করবে কিন্তু মাঠের মাঝে হলে সবার দৃষ্টির আড়াল হবে এবং ফলন ও ভালো হবে।

“মাঠকে যাব লাঙল লিয়ে
হইছে চাষের বতর
গছা গছা ধান ফলাইয়া
পিষব তাদের গতর
ও তরা মাঠকে চলো
ফেল্যে খপর ফুল
চাষের বাদে গড়াই দিব
মুক্তা দিয়া ফুল।”

কৃষকরা মহিলাদের আহ্বান জানান চাষের কাজে যাওয়ার জন্য। চাষ করতে যাওয়ার সময় তারা লাঙল, বলদ নিয়ে চাষ করতে যান। আশা করেন প্রচুর ফলন হবে। সেই ফসল মহিলারা মাথায় বহন করে নিয়ে আসবেন। পুরুষরা চাষের পর মহিলাদের জন্য মূল্যবান অলংকার তৈরি করিয়ে দেওয়ার লোভ দেখান।

“ধান রুইবি যতনে
তা না হলে আবাদ হবেক কেমনে

উগাল পাখাল তবেই চাষ
জমিতে রাখিস না ঘাস
ঘাস হলে ধান হবেক কেমনে
চাষ করবি যতনে
আইড় বাঁধবি যতনে
রোদ বৃষ্টি তবেই চাষ
খাত্যে হবেক বারো মাস
চাষ করবি যতনে
তা না হলে বাঁচবেক কেমনে” (Acharya- 2001)।

এই কবিতার মধ্যেও চাষ করার উপকারিতা এবং চাষ করার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

“একবার ধান লাগ্যে সারা বছর খাব
ফলন হবার ফালো হল্যে
খাতরাকে যাব।”

একবার ধান চাষ করলে এবং ভালো ফলন হলে আর কোন অভাব থাকেনা সেই কথাই এই কবিতার মধ্য দিয়ে পরিস্ফুটিত হয়েছে।

ধাঁধা :

হেঁয়ালি বা ধাঁধা লোকসাহিত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। সাধারণ মানুষের জীবন বা জীবিকার সাথে সম্পৃক্ত বা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় বস্তুকে সহজ সরল ও সরস কাব্যধর্মী রচনায় পরিণত করেছে এই হেঁয়ালি সাহিত্য (Baskey, 2017)। প্রকৃতি জগতে প্রথম পদার্পণে আদিম মানুষের পক্ষে সব কিছুই দুর্বোধ্য ছিল। তাই কার্যকারণ সম্পর্ক প্রথম খুঁজে পায়নি। প্রকৃতির রহস্যময়তা প্রতি মুহূর্তে তাদের বিভ্রান্ত করেছে। ঐ বিভ্রান্তির মধ্যে দিয়েই ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতা এবং বিবর্তনের মাধ্যমে যখন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা অর্জন করল তখন তাদের কাছে তাদের মতো করে সমসাময়িক যে ব্যাখ্যা উপস্থাপন হল তা তারা নিজেদের মধ্যেই সংরক্ষিত করে রাখল যাতে তা অন্য গোষ্ঠীর হাতে হস্তান্তরিত না হয়ে যায়। এই অভিজ্ঞতা তাদের নিজেদের প্রয়োজনীয়তার তাগিদে গোপনীয়তা অবলম্বন করতে শেখাল যা ধাঁধার সৃষ্টি করল। ধাঁধার মধ্যে পৌরাণিক উপাদান যথা সৃষ্টি সম্পর্কিত মিথ-এর নিদর্শন পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ তথা বঙ্গে ধাঁধার চর্চা দেখা যেত নতুন জামাই বাড়িতে এলে। আদিবাসিদের মধ্যে ধাঁধার প্রচলন এখনো বিদ্যমান। পূর্বে ধর্মীয় অনুষ্ঠান, কাওকে পরীক্ষার জন্য, সামাজিক অনুষ্ঠান, জন্মমৃত্যু সব কিছুতেই সুপ্রাচীনকাল থেকে ধাঁধার প্রচলন ছিল, যদিও এখন ধাঁধার চর্চা কম পরিলক্ষিত হয়। কৃষিজীবী মানুষ সারাদিনের কাজের ফাঁকে কিংবা কাজের শেষে কষ্ট লাঘব বা অবসর বিনোদনের জন্যে ধাঁধার সৃষ্টি করেছে। তবে লোকজীবনে ধাঁধার ব্যবহার এখনো দেখা যায় যেখানে পরিবেশমূলক কিছু ধাঁধার নিদর্শন পাওয়া যায়। ক্ষেত্রসমীক্ষাতেও এই প্রকার কিছু ধাঁধার নিদর্শন পাওয়া যায়—

“দেবতার গড়া রূপার বর
চারিদিকে তার সুনার ঘর
সুনার ঘরে লুকিয়ে থাকে
জীবজগৎ বাঁচিয়ে রাখে।”

এই ধাঁধাটিতে ধানের কথা বলা হয়েছে। গ্রামের কৃষিজীবী মানুষ ধানটিকে দেবতার তৈরি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ধানের মাঝখানে চাল থাকে। চালটি সাদা রঙের হয়ে থাকে। সেই কারণে চালটিকে রূপার ঘরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। যখন ধান পেকে পরিপূর্ণতা লাভ করে তখন ধানের ওপরের অংশটি সোনালি রঙের হয়ে ওঠে। সেই কারণে তাকে সোনার ঘরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। ধান পেকে গেলে বিশেষ পদ্ধতিতে ধান থেকে চালটিকে বের করা হয়। সমগ্র মনুষ্যকুলের প্রধান খাদ্য হিসাবে চাল গৃহীত হয়। প্রধান খাদ্য হিসাবে ভাতই মনুষ্যকুলকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে। এই হেঁয়ালির মধ্যে কৃষিজীবী মানুষের অন্তরের চির বক্তব্যটি ফুটে উঠেছে।

“ঘুমটা দিয়ে থাকে
সুন্দরী মুখটি ঢাকে
ভিতরে তার রূপসী বউ
নাম তুরা বলগা কেউ।”

এখানে গমের কথা বলা হয়েছে। গম ঢাকা থাকে। গমের দানা বের করতে হলে খোসা তুলতে হয়। উপরে পাতলা আঁশের মত অংশ থাকে তাকে ঘোমটার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

“আঁক কাটলাম পাঁক কাটলাম লাগিনু চারা
পাতায় পাতায় গাদা হয় নাম বল তুমরা”

এখানে পান চাষের কথা বলা হয়েছে। পান সংক্রান্ত নানা হেঁয়ালি মানুষজন লোকায়ত জীবনে সৃষ্টি করেছেন যার মাধ্যমে পান চাষের প্রকৃতি, ধরণ জানা সম্ভব। পান রোপনের জন্য বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বেড়ার মতো তৈরি করা হয়। পুকুরের পাঁক দিয়ে উঁচু সারি তৈরি করা হয়। পরে সেই পাঁকের মধ্যে পানের চারা বসানো হয়।

“মানুষ, পশুপাখির উপকারের জন্য জন্মায়
মরেও মানুষের বড়ই উপকার করে যায়।”

এখানের গাছ এবং তার উপকারিতার কথা বলা হয়েছে।

“এভাবে কাকের ইস্ট কোন বৃক্ষ হয়,
যাহার সান্নিধ্যে স্বাস্থ্য খারাপ নাহি হয়,
ফল ফুল ছাড়ি পাতা তারা খায়,
শিশুগণ স্ব-ইচ্ছায় খেতে নাহি চায়।”

এই ধাঁধার মাধ্যমে নিমগাছ-এর কথা বলা হয়েছে। নিমগাছ স্বাস্থ্যের পক্ষে কতটা লাভবান সেই কথাই ফুটে উঠেছে।

প্রবাদ :

প্রবাদ হল একটি গোষ্ঠীর সামাজিক ও প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ ফল। সামাজিক অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে মানুষ মৌখিক সৃষ্ট প্রবাদকে স্মৃতি ভাণ্ডারে বহুদিন ধরে সঞ্চিত করেছে। প্রাথমিকভাবে প্রবাদ ছিল দুর্বোধ্য। যতক্ষণ না পর্যন্ত সত্যতা যাচাই হত ততক্ষণ পর্যন্ত চেষ্টা চলত বাক্যটি বোঝানোর। প্রবাদ আঞ্চলিক উপাদানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। বহু সংখ্যক প্রবাদে প্রতিবিস্মিত হয়েছে সামাজিক ধর্মীয় বিষয়াদি। বিয়য়ভিত্তিক প্রতিনিধি স্থানীয় প্রবাদগুলি বিশ্লেষণ করে মানুষের প্রাকৃতিক উপাদানগুলির সম্পর্কে শুধুমাত্র মানবিক চরিত্র চিত্রায়নের জন্যই নয়, প্রাকৃতিক সব কটি বস্তুর উপযোগিতাকে প্রবাদের মধ্যে সংরক্ষণ করে চিরকালীন শিক্ষার বিষয়ও করে তুলেছে যা মানুষকে আমরণ সকল বস্তু সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখতে সাহায্য করে। প্রাকৃতিক জড় ও সজীব বস্তু পশু-পাখী, গাছ-ফুল-ফল, নদী-নালা,

মাছ সবই কোন না কোন ভাবে মানুষের চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছে তাদের স্বভাবজাত গুণকে দিয়ে। অর্থাৎ মানবজীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সেগুলির স্বভাব বৈশিষ্ট্য এক হয়ে যাচ্ছে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ব্যবস্থায় সোজাসুজি সব চরিত্রকে প্রকাশ করা যায়নি তাই প্রবাদের মত আবরণের আড়ালে রেখে প্রকাশ করা হয়েছে। সাহায্য করেছে প্রকৃতি। ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে সংগৃহীত প্রবাদের মধ্যেও পরিবেশ সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়, নিম্নে সেগুলি উল্লেখ করা হল :

“নারকেলের গৌড়ায় মাটি, তাতেই সুখ পরিপাটি।”

নারকেল গাছ পুতলে এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ করে ভালো করে বড় করলে যে ফলন হয় তা বিক্রি করলে টাকার অভাব মিটে সুখপ্রাপ্তি হয়।

“রুয়ে কলা না কেটো পাত, তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।”

কলা গাছ চাষ করলে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হয়।

“নদীর কূলে চাষ আরাম বারোমাস।”

আমরা সবাই জানি নদীকূল উর্বর হওয়ায় চাষের জন্য উপযোগী।

“বাড়ির গাছা, পেটের বাছা।”

বাড়ির গাছ আর নিজের সন্তান উভয়ই উপকারে আসে।

মূল্যায়ন :

লোকসাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন লোকপূরণ, ব্রত, ছড়ায় বৃক্ষ-লতা-পুষ্প-ফলের অফুরন্ত উপাচার অনিবার্যভাবে প্রয়োজন হয়। প্রকৃতি যে কত গভীরভাবে লোকমননে প্রভাব বিস্তার করেছে বর্তমান প্রবন্ধটিতে পরিবেশ সচেতনতার তারই উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। আমাদের সংস্কৃতির বীজ যেখানে নিহিত আছে সেই লোক সমাজেও এই পরিবেশ ভাবনার বিষয়টি যে প্রসারিত হয়েছে তা বলা বাহুল্য আমরা তা উপলব্ধি করতে পারি বিভিন্ন লোকসাহিত্যের মধ্যে। বর্তমান সময়ে এই বিশ্ব উষ্ণায়নের সময়ে চারিপাশে যে ভয়ানক খারাপ প্রভাব পড়েছে, লোকসাহিত্যে তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে নানান রকমের পন্থার কথা আগে থেকেই উল্লেখ করা আছে। আমরা কিভাবে নানান রকমের শস্য চাষ, বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে, এবং গবাদি পশুদের পূজা করার মধ্যে দিয়ে পরিবেশ তথা পশুপাখিদের রক্ষা করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার একটা স্পষ্ট ধারণা আমাদের মধ্যে তৈরি করতে সাহায্য করে এই লোকসাহিত্যই। আজকের দিনে এই দুরবস্থার হাত থেকে মুক্তি পেতে গেলে লোকসাহিত্য একটি উপযুক্ত পন্থা হয়ে উঠতে পারে। এই লোকসাহিত্যের মাধ্যমে আমরা পরিবেশের ওপর আরও বেশি সচেতন হয়ে উঠতে পারি। আমরা এটাও উপলব্ধি করতে পারি যে পরিবেশের ভারসাম্য সঠিক ভাবে বজায় রাখতে গেলে মানব সমাজের সাথে সাথে সমস্ত উদ্ভিদ ও পশুপাখি সমাজকেও পরিবেশে সমান ভাবে সম্মানের সাথে বাঁচতে দিতে হবে। গাছপালা ও পশুপাখীদের প্রতি ভালোবাসা অটুট থাকতে হবে, আর এটাও ভালভাবে বুঝতে হবে যে এই পৃথিবীতে আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। সময় এসেছে যখন পরিবেশের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পুনরায় পরীক্ষা করাতে হবে যাতে সীমাবদ্ধ প্রাকৃতিক সম্পদের অনর্থক শোষণ নিরীক্ষণের জন্য মানুষের ক্রিয়াকলাপ পুনর্গঠন করা যায়। সুপরিচিত ফোকাটেলগুলি, যদি যথাযথভাবে চয়ন করা হয় তবে এই দিকে দক্ষতার সাথে কাজ করার অসীম সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবেশগত শিক্ষার জন্য কীভাবে লোক সাহিত্যগুলি কার্যকর হতে পারে তার কয়েকটি পদক্ষেপ নীচে বর্ণিত হয়েছে :

১. লোকেরা যখন আঞ্চলিকভাবে প্রাপ্ত গুল্ম এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের সুবিধাগুলি সম্পর্কে সচেতন হয়, তারা

এটিকে মূল্যবান সম্পদ হিসাবে সংরক্ষণ করে। যদি এই কাহিনীগুলিতে নির্দিষ্ট মান নির্ধারিত হয়, তবে পরিবেশের ধ্বংস নয়, সুরক্ষা শুরু করা হবে।

২. লোককাহিনী, ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান ব্যবস্থার ভাণ্ডার, যা অধ্যয়ন করলে পরিবেশ-বান্ধব মনোভাব গড়ে তোলে এবং শিশু মননে প্রকৃতির সম্পর্কে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলে। প্রকৃতির সাথে ঘনিষ্ঠতা বোধ বাচ্চাদের প্রকৃতিতে ফিরে যেতে এবং এ থেকে পৃথক না হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে দেয়। সুতরাং গল্প বলার মধ্যে একটি নতুন এবং ইতিবাচক পদ্ধতির সাথে পরিবেশগত শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এটি শিশুদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং সচেতনতার বিকাশ ঘটায় এবং একই সাথে পরিবেশগত সংস্কৃতি উন্নয়নে সাহায্য করে এবং পরিবেশগত শিক্ষা জাগরণে সাহায্য করে।
৩. প্রকৃতির সাথে উষ্ণ সংযোগ এবং প্রতিক্রিয়া বিকাশে সহায়তা করে। প্রতিটি জীবন-রূপ এবং প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক ও মানব জীবনের আন্তঃনির্ভরতা সম্পর্কিত মৌলিক জীবন সংযোগ গল্পগুলিতে উপস্থাপিত হয় এবং এগুলি প্রাকৃতিক জগত সম্পর্কে চিন্তাভাবনার একটি রূপ দেয়। সুতরাং লোকতত্ত্বগুলি মানুষকে ইকো বা বায়োসেন্দ্রিক ব্যক্তিতে রূপান্তর করতে ভূমিকা রাখে।

তথ্যসূত্র :

- “Bain, W. K. 2016. ‘Bishnupur : A Town of Cultural Excellence’, Journal of Anthropological Survey of India, 65 (1): 89-105.
- বাস্কে, ধী. ২০০১. “আদিবাসী সমাজ ও পালাপর্বন”, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার : ১০৬।
- জেলা শুমারী হ্যান্ডবুক, বাঁকুড়া, এবং ভারতের আদমশুমারি. ২০১১. গৃহমন্ত্রণালয়, ভারত সরকার (অ্যাকসেসএডঅন ১৯. ১২. ২০২২)।
- মজুমদার, দি. ২০০১. “আদিবাসী লোককথা”, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার : ১০৬-১১২।
- আচার্য, ন. ২০০৩. “লোকসংগীত ও ছড়া, রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি”, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার : ১৫৭।
- Internet, https://www.censusindia.gov.in/2011census/DCHB/DCHB_A/19/1913_PART_A_DCHB_BANKURA.pdf, Date : 19.09.2018

লেখক পরিচিতি

প্রভাষক, ভূগোল বিভাগ

কাঁচরাপাড়া কলেজ

email : shilpaabiswass@gmail.com